Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 224 – 232
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কাশীবাসিনী : পতিতা নারীর স্নেহময়ী রূপ

প্রিয়া পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : paulshika9085@gmail.com

Keyword
কাশীবাসিনী, মালিনী, গিরীন্দ্র, কাহিনি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্ল্যাং।

Abstract
পতিতা নারীর স্নেহ বাৎসল্যের অনবদ্য নির্মাণ 'কাশীবাসিনী' গল্প। গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র- কাশীবাসিনী, মালতী এবং তার স্বামী গিরীন্দ্রনাথ। কাহিনির প্রথমেই দেখতে পাই খগোল বাজার থেকে কিছুদূরে স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসস্থান। চাকরিসূত্রে গিরীন্দ্র মাসিক ৩ টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। চাকরিতে যোগ দেবার পর গিরীন্দ্র বছর ধরে সঙ্গদোষে মদ্যপান করে উৎশৃংঙ্খল জীবনযাপনের মত্ত ছিল। কিন্তু বছর দুই হল মালতীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কিছুটা ভদ্র হয়েছে। এদিকে গিরীন্দ্র চাকরিসূত্রে পুরো দিন অফিসে থাকে, তাই মালতীর নি:সঙ্গ একাকী জীবনের একমাত্র সঙ্গী ভজুয়ার মা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মালতীর যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র দরজা ছিদ্রপথ। এমন কঠিনসর্বস্ব মালতীর নি:সঙ্গ জীবনে শীতকালে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তার বাড়িতে উপস্থিত হন 'বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক'। পরের গাড়ি রাত একটায় বলে মালতী অপরিচিতা প্রৌঢ়াকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। ক্রমশ তাদের মধ্যে বিভিন্ন আলাপচারিতায় ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় হয়। একটি বিশেষ কারণে কাশিবাসিনীর রাতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাদের সংসারে অপরিচিতা কাশীবাসিনীর হঠাৎ আবির্ভাবে গিরীন্দ্র অসন্তুষ্ট। কাশীবাসিনীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য বারবার স্ত্রীকে তাগাদা দিচ্ছিল গিরীন্দ্র। বরং দেখা গেল, গিরীন্দ্রের প্রয়োজনেই এইবারও তার যাত্রা স্থগিত হল। গিরীন্দ্রের তাড়িঘাটে বদলি ও আয়ের পদোন্নতির জন্য বিদায় উপলক্ষে স্থানীয় কিছু লোকজনকে নেমন্তন্ন করেছিল। তখন কাশীবাসিনী বিশেষভাবে মালতীকে রান্নায় সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে কাশীবাসিনী গিরীন্দ্রের দেনা মিটিয়ে দেবার জন্য নির্দ্বিধায় তার হাতে ত্রিশ টাকা তুলে দেন। পরদিন কাশীবাসিনীসহ গিরীন্দ্র ও মালতী তাড়িঘাটের উদ্দেশ্যে রেলযাত্রা। গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীকে তাড়িঘাটে যেতে বললেও শেষপর্যন্ত তার জিদে সায় না দিয়ে কাশীবাসিনী দিলদার নগর থেকে একই গাড়িতে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাড়িঘাটে পৌঁছে মালতীর গয়নার বাক্স না পাওয়ায় গিরীন্দ্র সন্দেহের তীর প্রথমেই কাশীবাসিনীর উপর বিদ্ধ হল। কিন্তু তখনও কাশীবাসিনীর আসল পরিচয় আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়নি। গিরীন্দ্রনাথ গয়নার বাক্সটির জন্য থানায় ডায়েরি করে। ডায়েরি করলেও প্রমোশনের খুশিতে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে তা ভুলে যায়। কিছুদিন পর হঠাৎ কাশীবাসিনী রাশিকৃত

গহনা নিয়ে মালতীর বাড়িতে উপস্থিত হয়। এসেই নিজের আসল পরিচয় সকলের সামনে উদ্ঘাটন করেন। নিজেকে মালতীর মা বলে পরিচয় দেন। অতীতে 'কুলটা' জীবন গ্রহণ করেছিল বলে সে এতদিন লজ্জায় তার মেয়ের সামনে আসেননি। বিদায়ের পূর্বে আশীর্বাদস্বরূপ নিজের বাবার দেওয়া গয়না মেয়ের হাতে সমঝে দিলেন। প্রথমে কাশীবাসিনীর আসল পরিচয় মালতী না জানলেও অজ্ঞাতসারে তাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন তৈরি হয়। গহনা চুরির অপবাদে গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীকে দোষারোপ করলেও মালতীর কন্যাহৃদয় তা মানতে চায়নি। শেষে কাশীবাসিনী অপবাদ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ভুবন যাত্রা করেন, এমনই অনুমান করা যায় গল্পের শেষে।

Discussion

বাংলা ছোটগল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালি কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য জীবনে প্রভাতকুমারের প্রথম আবির্ভাব সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে নয়, তার কবিতা রচনা প্রসঙ্গই মনে পড়ে। 'দাসী', 'ভারত', 'প্রদীপ' প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রজীবনে থাকাকালীন প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথেরই অনুপ্রেরণায় প্রভাতকুমার কবিতা ছেড়ে গদ্য রচনা শুরু করলেন। তাঁহার একটি স্বীকারোক্তিতে পাই - 'রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই'। এরই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় 'বেনামী চিঠি' নামক ছোট গল্প। এরপর একে একে তিনি ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বাংলা ছোটগল্পের মোপাসাঁ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি (১২ই মাঘ, ১২৭৯) পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলা ধাত্রীগ্রামে। ছদ্মনাম শ্রীজানোয়ারমোহন শর্মা। পৈতৃক নিবাস পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুরুপ গ্রামে। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং মাতা কাদম্বরী দেবী। কৃতি ছাত্র প্রভাতকুমার বর্ধমান জেলার জামালপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও পাটনা কলেজ থেকে স্নাতকে উত্তীর্ণ হন। হালিশহরের ব্রজবালা দেবীকে তিনি বিয়ে করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকবছর পর তার মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার সুবাদে বিলেতে পাড়ি দেন। পেশায় ওকালতি করলেও বাংলা সাহিত্য রচনার প্রতি টান ছিল সর্বাগ্রে। তাঁর রচিত ১৪ টি উপন্যাস ও মোট ১০৮ টি গল্প নিয়ে ১২টি গল্প-সংকলনের সম্ভার রয়েছে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'রত্নদ্বীপ' (১৯১৫), 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'আরতি' (১৯২৪), 'সত্যবালা' (১৯২৫), 'বিদায় বাণী' (১৯৩৩), ইত্যাদি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ১২টি গল্পগ্রন্থ হল 'নবকথা' (১৯০০), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯১০), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭) 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১) 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৩), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৭), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৮), 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯), 'জামাতা বাবাজি ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১)। ১৮৯৬ সালের (ভাদ্র, ১৩০৩) 'দাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত প্রভাতকুমার শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল- 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'দেবী', 'ফুলের মূল্য', 'আদরিনী', 'কাশীবাসিনী', 'কুড়ানো মেয়ে'। বাঙালি জীবনের সুখ ও দু:খের জটিল জীবনের করুণ কাহিনীকে ছন্দময়ভাবে পরিবেশন করতেন প্রভাতকুমার। তাঁর রচনায় অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-

> "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায়, কল্পনা ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"[১]

ছোটগল্প রচনায় প্রভাতকুমার সিদ্ধহস্ত। সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে প্রভাতকুমারের গল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল-

১. বিদেশী জীবনাচরণ প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে।

২. প্রভাতকুমার তাঁর লেখনী দক্ষতায় অসাধারণভাবে পরিবেশন করেছেন বাক্-বৈদগ্ধ ও কৌতুক কিংবা হাস্যরস।

৩. বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরে প্রভাতকুমার স্থান দখল করেছেন।
৪. 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, 'প্রভাতকুমারের শিল্প-প্রকৃতির প্রবৃত্তিই ছিল গতি, স্থিতি নয়। পথ চলতে দু-হাতের মুঠোভরে জীবনের যতটুকু পেয়েছেন, কথার মধ্যে তাকে ঠিক তেমনি দিয়েছেন ধরে। ফলে, তাঁর অপেক্ষাকৃত অসফল উপন্যাস সাহিত্য গুচ্ছায়িত স্কেচ-এর সমষ্টি, অপরপক্ষে তাঁর ছোটগল্পগুলি চলতি জীবনের এক-এক টুকরো ভাসমান ছবি। একে লঘু কিংবা অগভীর বলবো না- এর মধ্যে রয়েছে নূতন প্রকৃতির প্রবাদ, রবীন্দ্র সৃষ্টির স্বাদুতা থেকে যা ভিন্ন'।
৫. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন তাঁর ছোটগল্পে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। পণপ্রথা জনিত উপন্যাস নিয়ে প্রভাতকুমারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের মধ্যে অন্যতম হল- 'অঙ্গহীনা', 'স্বর্ণসিংহ'। এই প্রসঙ্গে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেনের বক্তব্য, 'সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাতকুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, স্বদেশি আন্দোলন, বোমা ডাকাতি, নন কো-অপারেশন সবই তাঁহার গল্পের রস ও রসদ গাইয়াছে'।
৬. 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রভাতকুমার কখনোই নিষ্ঠুর গল্প লেখেননি। তাঁর পিতৃহৃদয় সকল অপরাধীকেই ক্ষমা করতে ইচ্ছুক'।

রবীন্দ্র জীবনীকার হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫৭ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এ সম্মানিত হন। এরপর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' ও ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। 'শ্রীমতী রাধামণি দেবী' ছদ্মনামে লিখে তিনি কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ই এপ্রিল(২২ চৈত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

'কাশীবাসিনী' গল্পের মূলভাব :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশিবাসিনী' গল্প 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (১৯০৩) বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী'তে সংকলিত হয় আশ্বিন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থের ভূমিকা আছে, 'ইহাতে নানা রসপূর্ণ ১৬টি গল্প আছে। অধিকাংশ ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা গ্রন্থন'। ষোড়শী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখককৃত বক্তব্যটি এই উদ্ধৃতিটির সঙ্গে মিল খুঁজে পাই: 'এই গ্রন্থে আমার ১৬টি গল্প প্রকাশিত হইল তাই ইহার নাম 'ষোড়শী'। গল্পের মূল চরিত্র কাশিবাসিনী সংযত চরিত্র হলেও যৌবনে তার পদস্খলন ঘটেছিল এবং তাই গল্পনাম চয়নের সঙ্গে কাশিবাসিনী চরিত্রের যোগসূত্র এইভাবেই ধরা পড়ে।

পতিতা নারীর স্নেহ বাৎসল্যের অনবদ্য নির্মাণ 'কাশীবাসিনী' গল্প। গল্পটি মোট ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। আবেগবর্জিত নিরাসক্ত দীর্ঘ অদর্শনের পর পতিতা রমনীর নিজ কন্যার প্রতি গভীর অনুরাগ, পাপের প্রায়শ্চিত্তসাধন নিয়ে গল্পের আখ্যানভাগ গঠিত। গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র- কাশীবাসিনী, মালতী এবং তার স্বামী গিরীন্দ্রনাথ। কাহিনির প্রথমেই দেখতে পাই খগোল বাজার থেকে কিছুদূরে স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসস্থান। চাকরিসূত্রে গিরীন্দ্র মাসিক ৩ টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। চাকরিতে যোগ দেবার পর গিরীন্দ্র বছর ধরে সঙ্গদোষে মদ্যপান করে উৎশৃংঙ্খল জীবনযাপনের মত্ত ছিল। কিন্তু বছর দুই হল মালতীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কিছুটা ভদ্র হয়েছে। এদিকে গিরীন্দ্র চাকরিসূত্রে পুরো দিন অফিসে থাকে, তাই মালতীর নি:সঙ্গ একাকী জীবনের একমাত্র সঙ্গী ভজুয়ার মা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মালতীর যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র দরজা ছিদ্রপথ। এমন কঠিনসর্বস্ব মালতীর নি:সঙ্গ জীবনে শীতকালে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তার বাড়িতে উপস্থিত হন 'বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক'। প্রৌঢ়ার সঙ্গে ছিল একটি পুঁটুলি ও একটি তোরঙ্গ। নবাগতা মহিলা মালতীকে বলেন যে-

> " 'আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল, তাই নামিয়ে দিলে। আবার সেই রাত একটায় গাড়ি। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই,-তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে এলাম'।"[২]

পরের গাড়ি রাত একটায় বলে মালতী অপরিচিতা প্রৌঢ়াকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। সাময়িক সময়ের জন্য হলেও মালতী অতিথি আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখেনি। ক্রমশ তাদের মধ্যে বিভিন্ন আলাপচারিতায় ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় হয়। গল্পকার তাদের সখ্যতাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা বর্ণনা করেছেন-

> "বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।"[৩]

গল্পে দেখা যায় কাশীবাসিনীও মালতীর নাম, তার বাবার বাড়ির ঠিকানা ও তাদের খবর, কতদিনের বিবাহ, তার স্বামীর অফিসে যাবার সময়, মাইনে কত পান- বিস্তারিত খবরের আদান-প্রদানে এদের ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়।

একটি বিশেষ কারণে কাশিবাসিনীর রাতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাদের সংসারে অপরিচিতা কাশীবাসিনীর হঠাৎ আবির্ভাব গিরীন্দ্র অসন্তুষ্ট, তার কথাতেই তা প্রকাশ পায়-

> " 'এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল?'... 'কাশী থেকে-একলা মেয়েমানুষ, -কি রকম বিধবা তাই ভাবছি।'... 'এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল'।"[৪]

কাশীবাসিনীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য বারবার স্ত্রীকে তাগাদা দিচ্ছিল গিরীন্দ্র। বরং দেখা গেল, গিরীন্দ্রের প্রয়োজনেই এইবারও তার যাত্রা স্থগিত হল। গিরীন্দ্রের তাড়িঘাটে বদলি ও আয়ের পদোন্নতির জন্য বিদায় উপলক্ষে স্থানীয় কিছু লোকজনকে নেমন্তন্ন করেছিল। তখন কাশীবাসিনী বিশেষভাবে মালতীকে রান্নায় সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে কাশীবাসিনী গিরীন্দ্রের দেনা মিটিয়ে দেবার জন্য নির্দ্বিধায় তার হাতে ত্রিশ টাকা তুলে দেন। পরদিন কাশীবাসিনীসহ গিরীন্দ্র ও মালতী তাড়িঘাটের উদ্দেশ্যে রেলযাত্রা। গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীকে তাড়িঘাটে যেতে বললেও শেষ পর্যন্ত তার জিদে সায় না দিয়ে কাশীবাসিনী দিলদার নগর থেকে একই গাড়িতে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পদক্ষতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনায় এবার কাহিনীর পট-পরিবর্তন করেন। যার রেশ ঘটনার পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসে চরম ক্লাইম্যাক্স। তাড়িঘাটে পৌঁছে মালতীর গয়নার বাক্স না পাওয়ায় গিরীন্দ্র সন্দেহের তীর প্রথমেই কাশীবাসিনীর উপর বিদ্ধ হল। কিন্তু তখনও কাশীবাসিনীর আসল পরিচয় আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়নি। গিরীন্দ্রনাথ গয়নার বাক্সটির জন্য থানায় ডায়েরি করে। ডায়েরি করলেও প্রমোশনের খুশিতে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে তা ভুলে যায়।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সকালে মালতী দেখল কাশীবাসিনীকে কুলিসমেত তাদের বাড়িতে আসতে। নগদ দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশের কাছ থেকে সে ছাড়া পেলেন। এসেই তার সঞ্চিত গয়না মালতীর হাতে তুলে দেন। 'সোনা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী ও পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত'। আত্মসংবরণ করে মালতী বলল-

> " 'সে আমি পারবো না।' ... 'আপনার রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?'... 'কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে নেব? সে আমি পারবো না'।"[৫]

মালতী তা নিতে না চাইলে কাশীবাসিনী তার গহনাগুলোকে দেবসেবায় দিতে বললেন। গল্পের শেষে পাঠকের সামনে কাশীবাসিনীর আসল পরিচয় গল্পকার উদ্ঘাটন করলেন। অনেক মান-অভিমানের পর কাশীবাসিনী জানান যে, 'আমি তোমার পোড়ারমুখী মা'। অতীতে 'কুলটা' জীবন গ্রহণ করেছিল বলে সে এতদিন লজ্জায় তার মেয়ের সামনে আসেননি। বিদায়ের পূর্বে আশীর্বাদস্বরূপ নিজের বাবার দেওয়া গয়না মেয়ের হাতে সমঝে দিয়ে বললেন-

> " 'সাবিত্রী হও, রাজরানী হও'-বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া, দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"[৬]

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাশীতে বাস করেন বলেই গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার নাম দিয়েছেন কাশীবাসিনী। কাশীবাসিনী হল এমন এক সত্তা, যে সত্তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলো ফুটে উঠেছে। আসলে কোন সত্যিই একা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রথমে কাশীবাসিনীর আসল পরিচয় মালতী না জানলেও অজ্ঞাতসারে তাদের মধ্যে স্নেহের

বন্ধন তৈরি হয়। গহনা চুরির অপবাদে গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীকে দোষারোপ করলেও মালতীর কন্যাহৃদয় তা মানতে চায়নি। শেষে কাশীবাসিনী অপবাদ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ভুবন যাত্রা করেন, এমনই অনুমান করা যায় গল্পের শেষে।

চরিত্র-চিত্রণ :

কাশীবাসিনী – 'কাশীবাসিনী' গল্পের কেন্দ্রীয় তথা মুখ্য চরিত্র কাশীবাসিনী। গল্পের প্রথমদিকে কাশীবাসিনীর পরিচয় অজ্ঞাত হলেও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তার প্রকৃত পরিচয়, যথার্থ উদ্দেশ্য ও স্বরূপ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। সম্পূর্ণ পরিচয়হীন বিধবা প্রৌঢ়া মালতীর দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ রহস্যময় প্রকটের মধ্য দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। প্রথমদিন তাদের সংসারে এসে মালতীর বৈবাহিক জীবন ও তার পিত্রালয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুকৌশলে তার কাছ থেকে জেনে নেন। গল্পকার তাদের কথোপকথনকে স্বচ্ছভাবে গল্পে চিত্রিত করেছেন -

> " 'কত মাইনে পান?'
> 'ত্রিশ টাকা'।
> 'তাছাড়া উপরি আছে?'
> মালতি লজ্জিত হইয়া বলিল, 'কি জানি'।"[৭]

কন্যা মালতীর প্রতি বাৎসল্য ও দাম্পত্য জীবনে অভাব শূন্যতার খবরে মা কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। অজান্তেই তাদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। তিনি নিজেই মালতীকে ঠিকমতো সংসারের স্বচ্ছল উপযোগী করে দেন ও তাকে রান্না শেখান। গিরীন্দ্রের চাকরির বদলি ও প্রমোশনের খুশিতে বাড়িতে খাবার আয়োজন করলে তিনি মালতীকে সাহায্য করেন। এমনকী গিরীন্দ্রের দেনা শোধ করবার জন্য কাশীবাসিনী বিনা বাক্যব্যয়ে জামাইয়ের হাতে ত্রিশ টাকা তুলে দেন দিলেন। তার মূল লক্ষ ছিল মেয়ের জীবনকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেওয়া। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পূর্বে গিরীন্দ্রনাথ এক অপরিচিতার আগমনে অস্বস্তি প্রকাশ করলে কাশীবাসিনী তা গুরুত্ব না দিয়ে মেয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসায় এক সম্পূর্ণ মাতৃমূর্তির প্রতীক হয়ে ধরা দেন পাঠকের কাছে।

তাড়িঘাটে যাবার পূর্বে মালতীর গয়নার বাক্স হারিয়ে গেলে গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীর উপর সংশয় প্রকাশ করলে কাশীবাসিনী তাদের বাড়িতে এসে প্রমাণ করে দেন, যে সে মালতীর গয়না চুরি করেন নি। মালতী লক্ষ করল, 'কাশীবাসিনীর মুখখানা যেন বড় গম্ভীর-বিষন্ন কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া উঠে'। আর্তকণ্ঠে কাশীবাসিনীর দু:খে মালতী বলে-

> " 'আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল'।"[৮]

মালতী তখনও জানত না যে রক্তের কী অপূর্ব বন্ধনে আবদ্ধ এই নারীর সঙ্গে। সর্বশেষে মালতীর হারানো গয়নার জন্য ব্যথিত চিত্তে তার সমস্ত সঞ্চিত মূল্যবান অলংকারগুলো মেয়ের হাতে তুলে দেন।

চৌদ্দবছর পর কাশীবাসিনী নিজের পূর্বজীবনের ঘৃণিত স্মৃতি মেয়ের কাছে প্রকাশ করলেন-

> " 'তাহলে তুমি জান-আমি তোমার পোড়ারমুখী মা।' ... 'যা ভেবেছ তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দো ধ'রে তার প্রায়চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জন নয়'।"[৯]

বেশ্যার খোলস থেকে মুক্ত হয়ে নিজের পাপজনিত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নতুন করে জন্ম নেওয়া কাশীবাসিনী চরিত্রকে গল্পকার এক অন্য মাত্রায় চিত্রায়িত করেছেন। কাশীবাসিনী পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শেষজীবনে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন করলেন এবং বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে 'সাবিত্রী হও, রাজরানী হও' বলে কন্যাকে আশীর্বাদ করলেন। মালতীও বোধ হয় তার মাকে পাবে না ভেবে কাঁদতে লাগলো। এই অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে মাতৃহারা কন্যার আকুলতা ধরা পড়ে।

মালতী – 'কাশীবাসিনী' গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও বাস্তব চরিত্র মালতী। সে কাশীবাসিনীর কন্যা। সহজ-সরল নিষ্পাপ গৃহবধূ মালতী হঠাৎ আগন্তুক অপরিচিতা প্রৌঢ়া কাশীবাসিনীকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় বর্তমানের মেয়েদের মত এত বিচার-বিবেচনা ছিল না, তাই তো সে কাশীবাসিনীকে দেখা মাত্রই তার কথায়

বিশ্বাস করে: 'হাত পা ধুয়ে ফেলুন। ...খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ্ হয়?' কাশীবাসিনীর সঙ্গে বিভিন্ন আলাপচারিতা ও ব্যবহারে মালতীর মনের সরল্যতা ধরা পড়ে।

মালতীর সরলতা তখনই ধরা পড়ে যখন সে অপরিচিতা কাশীবাসিনীকে তার সব অলংকার দেখায়। স্বামী মদ্যপানে আসক্ত হলে সে তখন প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, এমনকী নিজের জন্মদাত্রীর পূর্বজীবনের কথা স্বামীর কাছে গোপন রাখে কারণ সে জানতে পারল তার মা কুলটা, সংসারে কলঙ্কিনী। গিরীন্দ্র কাশীবাসিনী সম্পর্কে একাধিক সন্দেহজনক মন্তব্য স্ত্রীর কাছে করলেও মালতীর কাশীবাসিনীর প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা। গয়নার বাক্স চুরির প্রসঙ্গে গিরীন্দ্র কাশীবাসিনীর প্রতি সন্দেহজনক করলে মালতী কিন্তু তাকে নিজের মনিকোঠা থেকে দূরে সরাতে পারেনি। বরং সে কাশীবাসিনীকে দৃঢ় অবিশ্বাসের স্বীকৃতি দেয়, যার প্রমাণ মেলে গল্পের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে-

> " 'আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয় নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি'?"[১০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গল্পে মালতীকে অসামান্য নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। গল্পের শেষাংশে মালতীর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মায়ের সাইকোলজি সমান স্তরে উন্নীত হয়। পবিত্রতম মায়ের স্মৃতি মালতীর কাছে এখন অস্পৃশ্যের মতো। নিজের অজ্ঞাতসারে তার প্রতি মাতৃবৎ আকর্ষণ হয়েছিল। তার মা সমাজে স্খলিতা জেনে সে একটু দূরে সরে বসে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে তার হতভাগিনী মাকে দূরে সরাতে পারেনি। এখানে তীব্র দ্বিধাদ্বন্দ্বে গল্পকার তার স্মৃতি বেদনাতুর চিত্র অঙ্কন করেছেন-

> " 'কেন তুমি জানালে তুমি কে?'... মালতী আবেগভরে একবার বলিয়া যাইতেছিল-জানিয়েই ভাল করেছ। নইলে মা ত কখনো চোখে দেখতে পেতাম না! কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল-এ মা! নাই দেখতাম।"[১১]

প্রায়শ্চিত্তসাধন ও আত্মপাপস্খলন কাশীবাসিনীর বিদায়ের মুহূর্তে- 'মালতী আর থাকিতে পারিল না'। এর মধ্য দিয়ে নিজের জন্মদাত্রী মায়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার ট্র্যাজিক চিত্র ধরা পড়ে।

গিরীন্দ্রনাথ – মালতীর স্বামী গিরীন্দ্রনাথ 'কাশীবাসিনী' গল্পের জীবন্ত ও রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র। দাম্পত্য জীবনের পূর্বে চাকরিতে যোগদানের পর বছর দশেক গিরীন্দ্র সঙ্গদোষে নিয়মিত মদ্যপান রত থাকত। কিন্তু বছর দুই হল সে কিছুটা ভদ্র হয়েছে অর্থাৎ বিয়ে করেছে। মাতাল হলেও স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। তাই 'জাতে মাতাল তালে ঠিক' এই প্রবাদ- প্রবচনটি গিরীন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে পুরোদিন অফিসে থাকলে স্ত্রীর একাকিত্বকে কিছুটা লাঘব করার জন্য ভজুয়ার মাকে রেখে যায়। গল্পে মাতাল গিরীন্দ্র অভ্যাসই কাশীবাসিনী চরিত্রকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়।

গিরীন্দ্র গার্হস্থ্য জীবনের সঠিক, কিন্তু মদ্যপানের ফলে সে হয়ে যায় উদ্দাম, অসার।
কাশীবাসিনীর বয়স সম্পর্কে মালতীকে সে ঠাট্টা করে বলে-

> " 'ত্রিশ আর চল্লিশ কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না'।"[১২]

গল্পে দেখা যায়, কাশীবাসিনী সম্পর্কে গিরীন্দ্র অস্বস্হি প্রকাশ করলেও মদ্যপ অবস্থায় তার কোমল আবেগিক সত্ত্বা প্রকাশ পায়। তাই তো তাকে বলতে শোনা যায়-

> " 'আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।' ...'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?' ...'তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন'।"[১৩]

কাশীবাসিনীকে নিজেই প্রস্তাব দিয়ে সে ভুলে যায়। তার মাল বোঝাইয়ের জন্য কুলি পাঠাবে বলে, সে পাঠায় নি। তাই 'দিল্ দরিয়া' গিরীন্দ্র মাতাল অবস্থায় কাশীবাসিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে-

> " 'আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাজের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু'দিন যখন কষ্ট পেলেন আর একদিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবো'।"[১৪]

তাড়িঘাটে বদলি প্রসঙ্গে কাশীবাসিনীর তৎপরতায় তার বাড়িতে ভোজের আয়োজন করলে গিরীন্দ্র মালতীকে তার সম্পর্কে বলে-

> " 'দেখো ইনি একজন খালিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে করো না'।"[১৫]

অতিথি যে রন্ধনে পারদর্শী তার পরিচয় সে অনেক আগেই পেয়েছে। তাই সে মালতীকে অনুরোধ করে, 'দেখ,উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞেস কর দিকিন'।

প্রৌঢ়া সম্পর্কে সে মালতীকে বার বার সাবধান করে। এমনকী মালতীর গয়নার বাক্স হারিয়ে গেলে কাশীবাসিনীকে সে নানাভাবে হেনস্হা করে। গল্পকার তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন-

> " 'বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞেসা করতে পারি কখনও।'... 'সেই কালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস করো না। ওরা সর্বনেশে লোক-কাশীর মাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথাসর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল'।"[১৬]

শুধু সন্দেহ নয় কাশীবাসিনীকে সে নিয়মিত অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও তার বিরুদ্ধে রীতিমতো পুলিশে অভিযোগ করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ গিরীন্দ্রকে আর দেখা যায় না। সম্ভবত: গল্পকার গিরীন্দ্রকে সেখানে অনুপস্থিত রাখে বিধবা মা ও মেয়ের সম্পর্কের যাবতীয় মীমাংসা করবার জন্য। প্রভাতকুমার গিরীন্দ্র চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন পাঠকের সামনে। যেমন, মদ খেয়ে পান চিবানো; হাতে ছড়ি লওয়া তার শৌখিন মেজাজের একটি অঙ্গ; স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও সংসারের দায়িত্বপালন; কাশীবাসিনীকে অপদস্হ ও পরবর্তীতে তার প্রতি আবেগিকসত্ত্বা প্রকাশ; তাড়িঘাটে যাবার পূর্বে দেনাশোধ করবার জন্য সাহায্যপূর্বক কাশীবাসিনীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থ দায়িত্বসহকারে ফিরিয়ে দেবার জন্য তাকে তাড়িঘাটে যেতে বলে। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে গিরীন্দ্র দোষ-গুণ সম্পন্ন রক্তমাংসের বাঙালি চরিত্র।

গল্পের গঠনশৈলী :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'কাশীবাসিনী' গল্পটি রচনা করেছেন নাটকীয় কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা মাথায় রেখে। গল্পে গিরীন্দ্র-মালতীর দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ অপরিচিতা প্রৌঢ়ার আবির্ভাব, এরপর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ঘটনার অগ্রগতিতে কাশীবাসিনীর কর্তব্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে নামহীনা কাশীবাসিনী গল্পের প্রধান চরিত্র। গিরীন্দ্র-মালতী সংসারে কাশীবাসিনীর আগমনে গল্পের কাহিনী এগিয়ে যায়। কাশীবাসিনীর কথায়-

> " 'গাড়িতে যাচ্ছিলাম। টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল, ...একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই,-তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে এলাম'।"[১৭]

এতেই বোঝা যায় গল্পকারের সবকিছুই পূর্বপরিকল্পিত ছিল। খোঁজ না নিয়ে মালতীও অপরিচিতাকে তাদের গৃহে স্থান দেয়। এরপর গল্পে ঘটতে থাকা এক-একটি ঘটনায় পাঠকও লেখকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। কাশীবাসিনী মালতীকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেন ও মালতী সংসারকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেন, যা গল্পের প্রথমেই ধরা পড়ে-

১. 'না মা আলোচাল কিনতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে।'

২. মালতীকে জলখাবার আনতে 'নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।'

৩. গিরীন্দ্রের দেনাশোধ করতে 'কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।'

এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। দেখা যায় গিরীন্দ্র-মালতী- কাশীবাসিনীর চরিত্রগত মিল-অমিল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত গল্পের ছককে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান গল্পকার।

গল্পের ক্লাইম্যাক্স গয়নার বাক্স চুরি তথা হারানোর উপর ভিত্তি করে মালতী ও কাশীবাসিনীর সম্পর্কটি তীব্রতম রূপ পায়। কাহিনীর শেষে সে তার মায়ের পূর্বজীবনের কথা জানতে পারে। বাল্যকাল থেকে সে জানতো তার মা পরলোকগতা। বার্ধক্যে কাশীবাসিনী নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান, বিষয়-সম্পত্তি থেকে অব্যাহতি ও মেয়ের কাছ থেকে মুক্তি চান। তাই সে নিজের মূল্যবান গহনাগুলি মেয়ের কাছে সমর্পণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে যাবার পূর্বে সন্তান

বিচ্ছিন্না মা সন্তানের আলিঙ্গনে নিজের পাপ মুক্তির আস্বাদ পেতে চান। গল্পের কাঠামোয় মালতী-কাশীবাসিনী অচ্ছেদ্য নাড়ির সম্পর্ক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং বলা যায়, 'কাশিবাসিনী' গল্পটি যদি কাঠামোর দিক দিয়ে আরো ছোট জটিলতায় সংযম হতো তাহলে আরো রুচিশীল হত বলে মনে হয়।

ভাষাশৈলী :

'কাশিবাসিনী' গল্পটিতে সংযোজিত হয়েছে কথ্য ভাষা ও চলিত ভাষা। কোথাও কোথাও কাশীবাসিনীর উদ্দেশ্যে গিরীন্দ্রের মুখে 'মাগী' বা 'বেশ্যা' শব্দের উল্লেখ পাই ('মাগী' একটি স্ল্যাং শব্দ। স্ল্যাং কোন স্বতন্ত্র ভাষা নয়-প্রত্যেক ভাষার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট শব্দ ভান্ডারকেই স্ল্যাং বলা হয়। প্রাচীন অভিধানে স্ল্যাং কে বলা হত 'language', কিন্তু পরবর্তীকালে একে চিহ্নিত করা হতো 'Vocabulary' হিসেবে। স্ল্যাং ব্যবহার প্রধানত গালিগালাজ ও অভিসম্পাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। দেখা যায় হাজার উনিশ শতকের আগে স্ল্যাং সচেতনতা বাংলায় ছিল না। অশ্লীলতা ও রুচির অবনতি যখন ঘটেছে তখনই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সেই শিথিলতা ঘটেছে সাহিত্যে এটা আমরা বরাবরই লক্ষ করি। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ স্ল্যাং-এর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে তেমন নাগরিক সংস্কৃতি না থাকায় স্ল্যাং বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় নি। আধুনিকযুগে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে দেব নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে মানবমুখীন হয়ে ওঠে। বাংলায় গদ্যচর্চার সূত্রপাত থেকে নাটক, উপন্যাস, কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাং বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্য বিংশ শতাব্দীতে সাধুভাষা ছেড়ে চলিতভাষাকে গ্রহণ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে চলিতভাষা চর্চা বিশেষ গতি লাভ করে। সাধুভাষার তুলনায় চলিতভাষায় স্ল্যাং ব্যবহার প্রবল। কারণ চলিতভাষা হল মুখের ভাষা। নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেড়ে যায়)। অবহেলিত, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বর্ণনায় 'মাগী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে গিরীন্দ্রের মুখে এই শব্দগুলির উল্লেখ করিয়েছেন গল্পকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

সামগ্রিক কাহিনির শেষে বলা যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশীবাসিনী' গল্পে যেন শরৎচন্দ্র অবাধে বিচরণ করছে। কেননা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত প্রভাতকুমারের গল্পে পতিতা নারীর করুণ কাহিনি ফুটে উঠেছে। এক পদস্খলিত নারীর অপারস্নেহের কাহিনি গল্পের মধ্যে গভীর সুরসঞ্চার সৃষ্টি করেছে। গল্পের শেষে মা ও সন্তানের মিলনের পর কাহিনিকে ব্যাপ্তি না করে গল্পকার স্বাভাবিক ছন্দে কাহিনিকে গড়ে তুলেছেন। সমাজ বাস্তবতা ও ভাষাগত প্রকরণের দিক থেকে প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছেন। বাংলা ছোটগল্প রচনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিল্প কুশলতা সম্বন্ধে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তার ছোটখাটো বৈষম্য অসঙ্গতির উদ্ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনা লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি কৌশলে এই সমস্ত দিক দিয়েই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন। ...ছোটগল্পের আর্ট ও রচনা কৌশল, ইহার পরিমাণবোধে ও সমাপ্তি বিষয়ে তাহার দক্ষতা অসাধারণ।'

সার্থক ছোটগল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা ও স্থায়ী আসন লাভ করেছেন একথা নি:সন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. শিশিরকুমার দাস; 'বাংলা ছোটগল্প'; অক্টোবর,১৯৬৩; দেজ পাবলিশিং; কলকাতা-৭৩; পৃ. ১৫১
২. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত); 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'; বিংশ মুদ্রণ-বৈশাখ, ১৪২৪; প্রকাশ ভবন; ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩; পৃ. ৬০
৩. তদেব; পৃ. ৬৪-৬৫
৪. তদেব; পৃ. ৬২
৫. তদেব; পৃ. ৭৩

৬. তদেব; পৃ. ৭৫
৭. তদেব; পৃ. ৬১
৮. তদেব; পৃ. ৭৩
৯. তদেব; পৃ. ৭৪-৭৫
১০. তদেব; পৃ. ৭২
১১. তদেব; পৃ. ৭৫
১২. তদেব; পৃ. ৬২
১৩. তদেব; পৃ. ৬৩
১৪. তদেব; পৃ. ৬৬
১৫. তদেব; পৃ. ৬৭
১৬. তদেব; পৃ. ৭০-৭১
১৭. তদেব; পৃ. ৬০

আকর গ্রন্থ :

১. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত); 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'; বিংশ মুদ্রণ-বৈশাখ,১৪২৪; প্রকাশ ভবন; ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩